‘ঈশ্বরের কাছে পৌঁছয় কেবল ভক্তি’

কোরবানির মূলে সম্পূর্ণ ভক্তি। এবং ন্যায়বন্টন। কোরবানির মাংসও ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নয়, এক-তৃতীয়াংশ দরিদ্রকে দেওয়ার নিয়ম।

জহর সরকার

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, ০০:০৩:৪৬

ভক্তি ও বিশ্বাস। মাউন্ট আরাফত, মক্কা। সেপ্টেম্বর ২০১৫। ছবি: রয়টার্স।

পবিত্র হজ-এর মাসের দশম দিনে পালিত হয় ইদ-উল-জুহা। অন্য নাম ইদ-আল-আদা। এটি চার দিনের উৎসব। মক্কার পূর্ব দিকে মাউন্ট আরাফত থেকে হজযাত্রীদের নেমে আসার সঙ্গে এই উৎসবের সমাপতন ঘটে। পারস্যে এর নাম ইদ-এ-গোরবান, তুরস্কে কুরবান বয়রামি, বলকান অঞ্চলে কুরবান বজরম, মান্দারিন চিনা ভাষায় একে বলে কুয়েরপাং চিয়ে, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় হারি রায়া কোরবান, বাংলায় কোরবানির ইদ।

প্রাতরাশের আগে ইদের সমাবেশে নমাজ পড়া হয়, সুন্না প্রার্থনার পরে শোনানো হয় খুতবা বা পবিত্র ধর্মের বাণী, তার পর নির্দিষ্ট পশুকে কোরবানি করা হয়। ইসলামের সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতি অনুসারে অনুষ্ঠানের কিছু রকমফের হয়। যেমন ইন্দোনেশিয়ায় একটি ছোট্ট জায়গা আছে, সেখানে ভোর থেকে তকবির বা ঈশ্বরের বাণী নানা ভাবে উচ্চারণ করে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

দেড়শো কোটি মুসলমান, দুনিয়ার প্রায় সিকিভাগ মানুষ কেন এত আবেগ ও ভক্তি সহকারে কোরবানির প্রথা পালন করেন? প্রথমেই খেয়াল করা দরকার, নানা ধর্মেই বড় আকারে পশুবলির রীতি আছে। যেমন, নেপালে গদাইমাই উৎসবে খোলা আকাশের নীচে কয়েক লক্ষ মহিষ বলি দেওয়া হয়। কিন্তু রক্তপাতের কথা সরিয়ে রেখে মূলে যাওয়া যাক। মূল কাহিনিটি আব্রাহাম বা ইব্রাহিম সম্পর্কিত। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান, তিনটি ধর্মের উৎসে আছেন ঈশ্বরের এই দূত। এই দিনটিতে ঈশ্বরের নির্দেশে তিনি নিজের পুত্রকে বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন— চরম ত্যাগ। মুসলমানরা এই পুত্রকে বলেন ইসমাইল, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাঁকে চেনেন আইস্যাক বা ইশাক নামে। কোরানে ইসমাইলের ভক্তি ও বিশ্বাসের কথাও আছে— তিনি ইব্রাহিমকে ঈশ্বরের আদেশ পালনের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন, নিজের চোখ দুটি ঢেকে রাখতে বলেছিলেন, যাতে পুত্রের মাথায় অস্ত্র নামিয়ে আনার সময় তাঁর হাত না কাঁপে। আব্রাহাম যখন চোখের বাঁধন খুললেন, তখন অবশ্য দেখলেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁর পুত্রের স্থান গ্রহণ করেছে একটি মেষ। তাকে উৎসর্গ করেই ঈশ্বরের আদেশ পালিত হল। কোরবানির মূলে আছে এই সম্পূর্ণ ভক্তি। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, পশুটি ধর্মীয় আচারের জন্যই ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট। কোরবানির পশুটিকে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে বেছে নেওয়া হয়, যেন কোনও খুঁত না থাকে। তাকে পরিবারের এক জন সদস্যের মতো যত্ন ও পরিচর্যা করা হয়। মরক্কোর গ্রামে থেকে আবদেল্লা হাম্মোদি দেখেছিলেন, মেয়েরা কী ভাবে স্থানীয় লোকাচার অনুসারে কোরবানির প্রাণীটির চোখে সুরমা পরিয়ে দিতেন। বিশেষ নজর রাখা হয়, যাতে প্রাণীটির মনে কোনও অকারণ আতঙ্ক তৈরি না হয়, সে জন্য জবাইয়ের অস্ত্রটি শেষ মুহূর্তের আগে অবধি লুকিয়ে রাখার নিয়ম। কোরবানির আগে পশুটিকে পবিত্র কাবা-র দিকে মুখ করে দাঁড় করানো হয়, সর্বশক্তিমানের নামে প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করা হয়। হালাল-এর নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মেনে ছোরাটি চালানো হয়।

যিনি পশু উৎসর্গ করছেন, তিনি নিজে জবাই করবেন, এটাই আদর্শ রীতি। অন্তত কোরবানির সময় পবিত্র বাক্যগুলি তাঁরই উচ্চারণ করা বিধেয়। মনে করা হয়, এ ভাবে মানুষের দেহ, মন ও প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হয়, এটাই ধর্মের অনুশাসন। শাসকরা ইদ-আল-আদা উৎসবটিকে প্রায়শই নিজেদের বৈধতা জোরদার করার উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছেন— আওরঙ্গজেব থেকে ইরানের শাহ, অনেকেই উন্মুক্ত ময়দানে কোরবানিতে অংশ নিয়েছেন। খেয়াল করা ভাল, দুনিয়া জুড়ে প্রতিদিন অজস্র পশু নিধন করা হয়, কিন্তু যাঁরা সেই সব পশুর মাংস খান তাঁদের হাতে এক ফোঁটা রক্ত লাগে না, তাঁরা এমনকী পশুহত্যা চোখেও দেখেন না।

পবিত্র কোরানে আছে, ‘পশুর মাংস বা রক্ত ঈশ্বরের কাছে যায় না, তাঁর কাছে পৌঁছয় কেবল ভক্তি।’ মানুষের বদলে পশু উৎসর্গের নিয়মিটর নানা গভীর অর্থ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, ইসলামের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞ জন বাওয়েন বলেছেন, ‘এটা পরিষ্কার যে, কিছু কিছু

সমাজে কোরবানির প্রাণীটিকে সেই প্রাণী যিনি উৎসর্গ করছেন, সেই ব্যক্তির প্রতীক হিসেবেই দেখা হয়, তার মাংস ওই ব্যক্তির মাংসকেই সূচিত করে।

মুসলমানদের মধ্যে একটি অংশ আছেন, যাঁরা নিরামিষাশী। ব্যক্তির উপরে কোরবানি দেওয়ার কোনও ধর্মীয় বাধ্যতা নেই। ইসলাম 'ন্যায়বণ্টন'-এর খুব কঠোর নিয়ম অনুসরণ করে, 'জাকত' নামক বাধ্যতামূলক দানধ্যানের নিয়মটি এই আদর্শ থেকেই আসে। কোরবানির মাংসও ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নয়, অন্তত এক-তৃতীয়াংশ দরিদ্র মানুষকে দেওয়ার নিয়ম। বিশেষজ্ঞ মাজিদা আজাদ বলেছেন, 'কোরবানির পশুটির চামড়াও ঈশ্বরকে নিবেদন করা যায়, অথবা সেটি বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় যারা জাকত পাওয়ার যোগ্য।'

এক শতাব্দী আগে ইসলাম ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থে জাফর শরিফ লিখেছিলেন, যাঁদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পশু আছে বা যাঁরা কিছুটা সচ্ছল, সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁদের পশু কোরবানি দিতে বলা হয়েছে। শরিফ বলেছেন, যে সব চতুষ্পদ প্রাণীর মাংস ধর্মানুসারে বিধেয়, কেবল তাদেরই কোরবানি করা যায়, যদিও গবেষকরা দেখেছেন, পূর্বাঞ্চলে দরিদ্র এলাকায় হাঁস-মুরগিও জবাই করা হয়ে থাকে।

মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, কেবল ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণরাই মৃত্যু-সেতু 'পুল-সিরাত' পার হয়ে বেহেশ্‌তে যেতে পারেন, এবং সে জন্য ইদের কোরবানি অত্যন্ত মূল্যবান। এই সেতুটি এক গাছি কেশ অপেক্ষা সরু, তরোয়ালের চেয়েও ধারাল, যে ধার্মিক নয় সে এই সেতু থেকে মৃত্যুর গ্রাসে পড়ে যাবে। উনিশ শতকের ব্রিটিশ গবেষকরা বলেছিলেন, অনেক সময় সাত জন একসঙ্গে একটি পশুকে কোরবানি করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন এই পশুটি সহজে মৃত্যু-সেতু পার হতে পারবে। মালয়েশিয়ার এক কৃষক চমৎকার বলেছিলেন, 'একটি ছাগল বা মেষের পিঠে চড়ে এক জন বেহেশ্‌তে যেতে পারে, কিন্তু একটি মহিষের পিঠে সাত জনের জায়গা হয়ে যায়।'

প্রসার ভারতী-র সিইও। মতামত ব্যক্তিগত।